দুর্গাপূজা

পুরাণ মতে গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকা মীনাদেবীর কন্যা হিসাবে দ্বিতীয়বার জন্ম নেন দেবী দুর্গা। পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন দক্ষের কন্যা। কঠোর তপস্যার পর তিনি মহাদেবের মন জয় করেন এবং তাঁকে স্বামী হিসাবে পান। হিন্দুদের দেবদেবীর মধ্যে দেবী দুর্গার একটি বেশেষ স্থান আছে। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ত্রিলোকবিজেতা অত্যাচারী মহিষাসুরকে নিধন করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং দেবতাগণ দেবী দুর্গাকে প্রস্তুত করেন।

দুর্গাপূজার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। আগে এই পূজা হত বসন্তকালে। রামায়ণে রামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন। তারই সূত্র ধরে আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগে বাংলাদেশে দুর্গাপুজোরও অকালবোধন ঘটে। মহালয়ার দিন পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে শুরু হয় মাতৃপক্ষ। এই দিন দেবী দুর্গাকে তার বাপের বাড়ি, মর্ত্যলোকে আসার জন্য পুজোর ঘট পেতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এইদিন ভোরবেলায় ঘরে ঘরে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের “যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা”-তে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। এর পাঁচ দিন পর ষষ্ঠির দিন দেবীর বোধন করা হয়। শুরু হয় দুর্গাপুজো। ষষ্ঠি, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী কাটিয়ে দশমীর দিন দেবী বরণ করে দেবীর বিসর্জন হয় অর্থাৎ মা শ্বশুরবাড়ি ফিরে যান।

যে কোন উৎসবের থেকে এর আড়ম্বর অনেক বেশি। সম্প্রতি সার্বজনীন পুজোগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মন্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, প্রতিমা – সর্বক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার রয়েছে। লাউডস্পিকারে উচ্চকন্ঠে চিৎকার, অশোভন নৃত্যভঙ্গী, মদ্যপানজনীত অশালীনতা কোথাও কোথাও দেখা গেলেও সামগ্রিক ভাবে বাঙালির পুজো তার হৃদয়কে এক পরিচ্ছন্ন আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলে। নতুন

পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ মন্ডপে ভিড় করে প্রতিমা দেখার জন্য।

এই কয়েকদিন বাংলা যেন এক অসীম খুশির জোয়াড়ে ভেসে চলে।

ব্যক্তিগতজীবনে আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বা খ্রীষ্টান; কেউ ধনী। কেউ দরিদ্র – তবু শরৎ-এর আগমনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় সব মানুষই এই বৃহৎ উৎসবের আঙিনায় স্বেচ্ছায় অংশ নেয়। এই উৎসবের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে সর্বধর্মীয় মানুষের মিলনক্ষেত্র।

<u>দ্বীপজ্যোতি দাস</u>

<u>নবম শ্রেনী</u>

পাখি রহস্য

স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে আসছে। এক বিকেলে আমি জানালার পাশে বসে আছি – সামনে খোলা খাতা এবং পেন। আমার খুব ইচ্ছে করছে যে, স্কুলের বাংলা পত্রিকার জন্য কিছু লিখি। মাথায় হাজার চিন্তা ভীড় করে আসছে – কিন্তু কী লিখব কিছু ঠিক করতে পারছি না। হঠাত দেখি, তপ্ত দিনের শেষে যেন খুশির খবর নিয়ে আকাশের কোণে কালো মেঘ জমা হচ্ছে আর তাদেরই বুকে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক সাদা বক।

ঠিক তখনই বিদ্যুতের মতো আমার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল – আমার পত্রিকায় লেখার বিষয় – পাখি এবং তাদের বাসা।

আমি একবার বাবা-মায়ের সঙ্গে গাড়োয়াল হিমালয়ের কোনে সবুজে ঘেরা এক নির্জন গ্রামে একজন বার্ড ওয়াচারের ক্যাম্পে দু-তিন দিন কাটিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর তত্বাবধানে পাখি এবং তাদের বাসা দেখে অনেক কিছু জেনেছিলাম।

মাছ-রাঙা আমাদের "স্টেট বার্ড'। আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন রকমের রংচঙে মাছরাঙা দেখা যায়। কিন্তু সেখানে একটি বিশেষ মাছরাঙা দেখলাম, একদম সাদা রঙের এবং মাথায় ঝুঁটি (ক্রেস্টেড কিংফিশার)। সাধারণত মাছরাঙারা মাছ ধরেই খেয়ে ফেলে, কিন্তু এই মাছরাঙাটি মাছ ধরে প্রথমে সেটিকে পাথরের উপর আছাড় দিয়ে মেরে ফেলে, তারপর খায়। খাওয়ার সময় বেশি ছটফট যেন তার পছন্দ নয়।

আমরা অনেকেই বাবুই পাখি এবং তার সুন্দর বাসা দেখেছি। সেই বাসা পুরুষ বাবুইকেই বানাতে হয় – এটাও অনেকে জানে। কিন্তু এটা জানলাম যে, পুরুষ বাবুইকে তিন থেকে সাতটি পর্যন্ত বাসা বানাতে হয়। কেন জান? মেয়ে বাবুইটির যে কিছুতেই বাসা পছন্দ হয় না। কারণ, সে সবচেয়ে সুন্দর এবং সুরক্ষিত বাসা চায়। তার বাসা পছন্দ হয়ে গেলেই পুরুষ বাবুইয়ের বাসা বানানো থেকে ছুটি। বেচারা পুরুষ বাবুই----!

"ব্রাউন ডিপার'-এর কথা না বললেই নয়! তার শরীরে যেন বড্ড গরম। ঐ ঠান্ডায় উড়ে এসে সোজা নদীর মধ্যে ঝাঁপ, তারপর ডুবসাঁতারে বেশ খানিকটা গিয়ে তিনি ওঠেন, পরক্ষণে একটু উড়েই আবার ঝাঁপ! গায়ের জ্বালা যেন আর মেটে না।

আরেকটি পাখির বাসা দেখলাম, ঘাস-পাতা দিয়ে বানানো। তার সঙ্গে সে ব্যবহার করেছে শত-শত ছিঁড়ে আনা মাকড়শার জাল। কারণ, তাতে বাসা বেশ পোক্ত হবে!

টুনটুনি পাখির সেলাই-এর কাজের কথা আমরা অনেকেই জানি। সে বড় একটি পাতাকে মুড়ে, ঠোঁট দিয়ে সেটিকে সেলাই করে বাসা বানায়, এবং তাতে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চারা বেড়োলে তাদের খাওয়ানোর সুবিধার জন্য টুনটুনি একটি বড় কাঠি বাসার মুখে আটকে দেয় এবং খাবার নিয়ে এসে তার উপর বসে সেখান থেকে বাচ্চাদের খাওয়ায়। কী বুদ্ধি!

সবশেষে বলি, "ফ্যানটেল"-এর কথা। এরা সাধারণত উড়ন্ত পোকামাকড় খেতে ভালবাসে। পোকামাকড় ধরার সময় গাছের দালের যেখান থেকে সে উরে যায়, ঠিক সেখানেই ফিরে এসে সে বসে, একটুও নড়চড় হয় না। তাদের আরেক আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যখন মা পাখি একটি বাচ্চাকে খাওয়ায়, তখনই পাশের বাচ্চাটি মলত্যাগ করে। কিন্তু মা ফ্যানটেল বাচ্চাকে বাসায় মলত্যাগ করতে দেয় না। সে মলটি মুখে নিয়ে নদীতে ধুয়ে ফেলে। কারণ? মলটি বাসায় পরে শুকোলে সাদা রঙের হয়ে যাবে – তাতে শিকারীপাখিরা উপর থেকেই সহজেই বাসা দেখতে পেয়ে যাবে। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই এই ব্যবস্থা। বুদ্ধি যার বল তার।

আমরা, মানুষেরা, নিজেদের সবইচেয়ে উন্নত প্রাণী ভেবে থাকি এবং সবসময় বুদ্ধির বড়াই করি। কিন্তু পৃথিবীর এরকম কত ছোট ছোট প্রাণীর আশ্চর্য জীবনধারণের উপায় এবং তাদের বুদ্ধির কাছে আমরা মুহুর্তেই বোকা বনে যাই – তাই নয়, বলো তো?

<u>বলাকা বিশ্বাস</u>

<u>ষষ্ঠ শ্রেণী</u>

<u>"ক' বিভাগ</u>

বি হামিং বার্ড

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি হল বি-হামিং বার্ড। এদের পাওয়া যায় কিউবাতে। এর ওজন হল মাত্র ০.০৬ আউন্স বা দুই গ্রাম। পাখিটি লম্বায় আড়াই ইঞ্চি। এটুকু দেহের অর্ধেকই হল ওর ঠোঁট আর লেজ। নীলাভ সবুজ রঙের এই পাখিটি এতই ছোট যে, প্রায় একটা বড়সড়ো মৌমাছির মতই লাগে তাকে, আর সেইজন্যই তার নাম বি-হামিং-বার্ড। এদের লম্বা সুঁচালো ঠোঁটের জন্য মৌমাছির মত সরু, লম্বা ফুলের ভিতর থেকেও এরা মধু চুষে খেতে পারে। মধু খেতে গিয়ে এরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে পৌঁছে দেয় আর তাতেই গাছে ফল ধরে।

অনিন্দ্য শঙ্কর নন্দী

পঞ্চম শ্রেনী